সংবাদ

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষা, সাক্ষরতা ও সনদপত্র

আলমগীর খান

শিক্ষা ও সাক্ষরতা এক নয়। কথাটা ঘুরিয়ে বললে, অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা এক নয়। শিক্ষা ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক, সাক্ষরতা যার ছোট্ট একটা ভগ্নাংশ মাত্র। এ ভগ্নাংশটুকু বাদ দিয়েও একজন অতি বড়মাপের শিক্ষিত ব্যক্তি হতে পারেন। ইতিহাসের পাতা এমন বহু জ্ঞানী-গুণী-মহৎ মানুষের নামে ভরা। আমাদের দেশে সচরাচর যাকে শিক্ষিতের হার বলে, আসলে তা সাক্ষরতার হার। বড়লোক ও টাকাওয়ালার মধ্যেও এমনিভাবে অর্থকে লেজেগোবরে করে ফেলা হয়। বড়লোক বলতে বড় মনের মানুষ বোঝানো উচিত যিনি বিত্তহীনও হতে পারেন। আবার একজন অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি খুবই ছোট মনের মানুষ বা ছোটলোক হতে পারে। ছোটলোক ও গরিব মানুষের মধ্যেও এরকম অর্থ লেজেগোবরে করে ফেলা হয়।

আসলে মানুষ নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু একজন সুস্থ দেহমনের মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। সমাজ মানুষকে হাঁটতে, কাপড় পরতে, আগুন ব্যবহার করতে ও কথা বলতে শেখায়। এ যে কী বিরাট শিক্ষা তা সমাজকে অনুপস্থিত কল্পনা করলে মনের চোখে খানিকটা আন্দাজ করা যেতে পারে। জন্মের পর থেকে একা বনে বাস করা একটা শিশু উপরের চারটির মধ্যে কোনটিই শিখতে পারবে না। তাছাড়া পরিবার শিশুকে শেখায়। যে শিশুটি কোনদিন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি, অথচ জমিতে লাঙল দিতে শিখেছে বা নদীতে মাছ ধরতে শিখেছে বা দোকানে হিসাব করতে শিখেছে, এরকম আরো কত কাজ, যা দিয়ে সে আত্মনির্ভরশীল ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন করে তাকে নিরক্ষর বলা গেলেও অশিক্ষিত বলার অধিকার কারো নেই। যে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত কর্মকর্তা কোনো অপরাধ করে ধরার পড়ার কারণে এখন শুধু বসে বসে রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে বেতন নেয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন, তেমন লজ্জাহীন পরজীবী সম্মানীয় ব্যক্তিদের চেয়ে কি ওই স্বাবলম্বী শিশু বা কিশোরটি বেশি সম্মানীয় ও শিক্ষিত নয়? দুজনের মধ্যে আকাশপাতাল ভেদ তৈরি করেছে সনদপত্র নামের রাষ্ট্র-স্বীকৃত এক টুকরো কাগজ যা একজনকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যজনের নেই।

সাক্ষরতা বা অক্ষরজ্ঞান আসলে কি? এ কোনো জ্ঞান নয়, একটি দক্ষতা, একটি হাতিয়ারের মালিকানা। চোখ বা কান থাকা জ্ঞান লাভ করা নয়, কিন্তু জ্ঞানের হাওয়া ঢোকার দরজা। এসব দরজা ছাড়াও অন্য দরজার সাহায্যেও মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। চোখ-কানওয়ালা কিন্তু অন্ধ-বধির মানুষ, আবার অন্ধ কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হরহামেশাই জগতে জন্ম নেন। তবু চোখ ও কান দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির যে সুবিধা দেয়, তা অপরিমেয়। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা এরূপ যে কোন একটি শক্তির অভাবেই দুঃসহ জীবনযাপনে বাধ্য। অক্ষরজ্ঞান তেমনি আরেক জোড়া বাড়তি চোখ বা কান বা হাতিয়ার। সামান্য অক্ষরজ্ঞান না হলে আধুনিক কালে জীবনযাপন ও চলাফেরা করা যায় না বললেই চলে। সাক্ষরতা তাই সমাজ-রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য খুবই জরুরি।

নিজের অধিকার রক্ষা করে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ চোখ-কানের মতো অক্ষরজ্ঞান প্রয়োজন। শিশু যাতে সুস্থ চোখ নিয়ে বড় হতে পারে, সেজন্য সরকারি উদ্যোগে সারাদেশে স্কুলে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো হয়। চোখের সামনের চোখের জন্য যে আয়োজন, চোখের আড়ালের চোখের জন্য আরো বড় উদ্যোগ প্রয়োজন। একইভাবে হাত-পা শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য শিশুকে পোলিও-টিকা খাওয়ানো হয়। ভিটামিনের ও টিকার অভাবে শিশুর যে ক্ষতি হয়, অক্ষরজ্ঞানের অভাবেও একইরূপ ক্ষতি হয়। শিশুর মনে কোনো না কোনো অঙ্গহানি ঘটে যায়। কোনো ক্ষতিই শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নয়, জাতীয়।

তাই প্রত্যেক নাগরিকের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। শিক্ষা বা সাক্ষরতা মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের একটি বলতে এটাই বোঝায়। আমাদের রাষ্ট্রও সংবিধানে এরকম একটি দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু দায়িত্বটি পালন করার ক্ষেত্রে এ রাষ্ট্র এতটাই পিছিয়ে আছে যে, মনে হয় সেই স্বীকার করাটুকু খানিক দায়ে পড়ে। না পালন করতে পারলেই যেন কর্মকর্তারা বেশি খুশি। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই তার উপযুক্ত বয়সের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না।

প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? এতদিন এদেশে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বলে গণ্য করা হতো। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতিতে তা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হয়েছে। বাস্তবে আজো হয়নি। আসল কথা হচ্ছে শিশু কী শিখছে। একটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে বলা যাবে যদি সে কেবল পড়তে, লিখতে ও গুনতে পারে। ইংরেজের জগতে রিডিং, রাইটিং ও অ্যারিথমেটিক এই তিন শব্দের সামান্য 'আর' নিয়ে অসমান্য 'তিন আর' (থ্রি আর-স) বানানো হয়েছে। আমাদের 'পড়ালেখা' বা 'লেখাপড়া' কথাটাও খানিক ঐ ধাঁচের- অর্থাৎ পড়তে ও লিখতে পারা। আমরা শিশুর পড়া, লেখা ও গণনার ক্ষমতাকে আরো সংক্ষেপ করে বলতে পারি, কেউ যদি তার মনের কথা মাতৃভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারে তাহলেই সে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে। মনের কথা লিখে প্রকাশ করতে গেলে পড়া ও গণনার যোগ্যতা আপনি এসে পড়ে। এই সামান্য 'মনের কথা নিজ ভাষায় লিখতে পারা' দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সংজ্ঞা অনেক সঠিক, সহজ ও কার্যকরী।

কথা বলতে পারা ও হাঁটতে পারা যেমন মানবশিশুর মৌলিক অধিকার, লিখতে পারাও আধুনিক মানবশিশুর জন্য তাই। ধনী-গরিব, উচ্চ-নিচ, ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সব শিশুকেই এ শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব সমাজের। কখনো কখনো সমাজ একা তা পারে না বা পারতে দেয়া হয় না। এখানেই রাষ্ট্রের ভূমিকা। শিশুকে কথা বলা ও হাঁটা শেখানো না গেলে সমাজ কথাটার যেমন কোনো মানে হয় না, প্রত্যেক শিশুকে পড়তে-লিখতে শেখানো না গেলে রাষ্ট্র কথাটাও অর্থহীন। রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ব্যক্তিজীবনের ওপর বিরাট ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেমন, অক্ষরজ্ঞানের অভাব বা নিরক্ষরতা মানুষকে দাস জীবনযাপনের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

আমরা জানি, সমাজে কিছু অমানুষ থাকে যারা অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামিয়ে দাস ব্যবসা করে থাকে। শোনা যায়, হারানো বা চুরি-করা শিশুদের অঙ্গহানি করেও তারা এরকম ব্যবসায় নামায়। সোজা কথায়, কোনো মানুষের একটি অঙ্গহানি হলে তার অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যার অক্ষরজ্ঞান নামের চোখ বা হাতিয়ারের অভাব তার জীবনেও অনুরূপ বিপদ ওত পেতে থাকে। তার মানে এ নয় যে, নিরক্ষর মানুষ মাত্রই অভিশপ্ত জীবন যাপন করেন। বরং অন্ধ মানুষ যেমন, নিরক্ষর মানুষও তেমনি জ্ঞানী, ধনবান বা ক্ষমতাবান হতে পারেন, নাও পারেন। কেননা অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা, সম্পদ, ক্ষমতা কোনটির সরাসরি সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাক্ষরতাসম্পন্ন মানুষের চেয়ে নিরক্ষর মানুষকে প্রতারণা, অপমান, অত্যাচার ইত্যাদি করা সহজ। মানুষ শিক্ষিত হলে, সে শিক্ষা যত ত্রুটিপূর্ণই হোক, তার মধ্যে যে আত্মসচেতনতা ও সম্মানবোধ জন্মায় তার ফলে তাকে দিয়ে দুরবস্থার মধ্যেও যে কোনোরকম দাসত্ব করানো কঠিন। সাক্ষরতা যেহেতু মানুষের আরেক জোড়া চোখ বা হাতিয়ার, অপরাধীর বেশকিছুটা ভয় না পাওয়ার কারণ নেই।

সাক্ষরতাহীনতা তাই সমাজ ও দেশের জন্য অভিশাপ। অথচ বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিককে না হলেও অন্তত প্রত্যেক উপযুক্ত বয়সী ছেলেমেয়েকে শুধু লিখতে পারাটুকু শেখানো গেল না কেন? কেন দেশে এমন একটি শিশুও থাকবে যে স্কুলে যাওয়ার সুযোগই পেল না? কারণ সবসময় শিক্ষাকে শিশুর জন্য সুযোগ হিসেবে দেখা হয়েছে, তার অধিকার হিসেবে নয়। কোনো কোনো দরিদ্র পরিবারের শিশু স্কুলে যেতে পারে না, বা গেলেও কদিন পর ঝরে পড়ে। সে ক্ষেত্রে স্কুলকেই তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। কোন আধুনিক রাষ্ট্র কোনো শিশুকে এই একজোড়া চোখ বা এ হাতিয়ার ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না।

তবু সাক্ষরতা একটি অস্ত্র মাত্র। সনদপত্র সেই অস্ত্র যথেচ্ছ ব্যবহারের ব্যাপক স্বাধীনতা। তাই মানুষের ন্যূনতম সাক্ষরতা ও সম্ভব হলে সাক্ষরতানির্ভর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আরো উচ্চ দক্ষতার অস্ত্র যেমন দরকার, তা যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি হিসেবে সনদপত্রও প্রয়োজন- যার জন্য চারদিকে মধ্য-নিম্নমধ্যবিত্তের এত ছোটাছুটি। এ ছোটাছুটির মধ্যে অস্ত্রের সুষ্ঠু ব্যবহার শিক্ষা নয়, অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য সনদ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রধান। গাড়ি চালানো শেখা নয়, ড্রাইভিং লাইসেন্স চাই। আবার অস্ত্র ভাল ও মন্দ দুরকমেই ব্যবহার করা যায়। ছুরি ডাকাতের হাতে এক জিনিস, ডাক্তারের হাতে অন্য জিনিস। আর ডাক্তার যদি নীতিবিবর্জিত হন, তবে তা ডাকাতের হাতের চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

অসুস্থ প্রতিযোগিতামূলক লুটেরা সমাজে গাড়ি চালানো শেখার চেয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স বা অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার শেখার চেয়ে অস্ত্র যথেচ্ছ চালানোর লাইসেন্স- অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের চেয়ে সনদপত্র বেশি প্রয়োজন। ধনী-মধ্যবিত্ত-গরিব সব শ্রেণীর মানুষ যখন একেকটা সনদপত্রের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে, সেখানেও উচ্চ শ্রেণীর মানুষের তৈরি একটা কারসাজি আছে। ধরুন, সবার হাতে একই শিক্ষা-পর্যায়ের সনদপত্র দেখা যাচ্ছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, রাষ্ট্র বা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাকে সমান বিবেচনা করবে। তা কখনো হয় না। এবার দেখা হয়, সনদপত্রটি কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দেয়া। একারণে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নানা উপায়ে তার ইমেজ গড়ে তোলে। 'সেরা' স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাজেজা এই। চাকরির বাজারে আপনি কোন সামাজিক শ্রেণী থেকে উত্থিত তা নির্ধারণ করা হয়, আপনার সনদপত্রটি যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া তার নামের ইন্ডিকেটর থেকে। এতে নিরপেক্ষতার ভাণ বজায় রেখেও অনায়াসে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয়। নির্বাচনকারীর মনের অজান্তেই এ শ্রেণীস্বার্থটি কাজ করে। তারপরও নিম্নশ্রেণী থেকে যে ব্যক্তি সকল বাধা অতিক্রম করে উপরের সিঁড়িতে উঠে যেতে পারে, তাকে একটা জ্বলজ্বলে উদাহরণ হিসেবে আকাশে তুলে ধরে এ ব্যবস্থার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়।

শিক্ষা, সাক্ষরতা, সনদপত্র লাভ এবং পরীক্ষায় ভাল ফল করা ও তা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের মাতামাতি এর কোনটিই শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়। যেসব বিশৃঙ্খলা হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় ও যা নিয়ে মাঝেমাঝে হৈচৈ হয় তাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ব্যাপার নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার চিত্র। এর প্রতিটি অংশ প্রচলিত সমাজযন্ত্রের একেকটি স্ক্রু। সময়ে সময়ে দুয়েকটা স্ক্রুতে জং ধরে যায় বা স্ক্রু ঢিলা হয়ে যেতে পারে, তাতে সমাজে কমবেশি ঝাঁকি লাগতে পারে, তখন দুয়েকটা স্ক্রু ঘষেমেজে ঠিক করা হয় বা এমনকি পাল্টানোর কথাও বলা হয়। তাতে ঝাঁকুনি বন্ধ হয়, যাত্রীদের ভালই লাগে। কিন্তু স্ক্রু পাল্টালেই যন্ত্র পাল্টে যায় না। সাক্ষরতা, সনদপত্র লাভ, প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষায় ভাল ফল করা ও তা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের মাতামাতি একসূত্রে গাঁথা একটি মালা যা আমাদের আহামরি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ। এ প্রাণের চাপে সমাজ ও মানুষের সত্যিকার প্রাণের দফারফা!